Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 34-40
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা একাঙ্ক নাটক ও ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা': একটি পর্যালোচনা

পূজা ভুঁঞে, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, উত্তরপ্রদেশ, ভারত*

Received: 06.04.2025; Accepted: 22.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ritwik Kumar Ghatak is primarily known as a prominent figure in the film world, but he entered the artistic world through literature, as an editor of the magazine 'Avidhara' in 1947. Joining the 'Bharatiya Gana Natya Sangha' (Indian People's Theatre Association) influenced his art and literary world. From there, his play 'Jwala' was published in 1950. At the same time, he started writing, directing and acting in plays. This research article will focus on the playwright Ritwik Ghatak. Although he later thought that cinema was more sensitive than drama to reach more people at the same time. Therefore, he first chose stories, then Dramas and finally cinema as the best medium to connect with people. He has been associated with the 'Natya Andalan', has written original plays himself and translated plays. He even acted in several plays by Rabindranath in the early stages. It is known that Ritwik Ghatak's original plays are five in number, at least the manuscripts of which have been found. Among them, 'Jwala' is a 'Ekanka Natak' (One-Act Play), where a class of people is shown suffering from class discrimination in society. The author has depicted this division of the human race in a very realistic way. The play was translated into Hindi in addition to Bengali. The main subject of this article is to explore the direction in which Ritwik Ghatak's play 'Jwala' has taken in the crowd of 'Bangla Ekanka Natak', as well as the search for the connection between Ritwik Ghatak and 'Bangla Ekanka Natak'.

Keywords: Bangla Ekanka Natak, Class Discrimination, Indian People's Theatre Association, Jwala Natak, One Act Play, Partition, Post-Independence Indian Society, Ritwik Ghatak

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একাঙ্ক নাটকের সূত্রপাত হয়। মূলত ইউরোপীয় সাহিত্যে এই শ্রেণিকরণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতিহাস বলে ইংল্যাণ্ডে বার্নার্ড ও বেরীর সময়ে এই শ্রেণির নাটক উপহাসের বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে 'গেয়েটী থিয়েটার' ও 'রিপারেটরী থিয়েটার' প্রভৃতির হাত ধরে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একাঙ্ক নাটক পূর্ণতা লাভ করে। বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায়কে মনে করা হলেও, এ নিয়ে বেশ বিতর্কের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কারণ অবশ্য মন্মথ পূর্ববর্তী গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের বেশ কিছু নাটককে একাঙ্ক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটকেও একাঙ্কের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'একাঙ্ক' নাটকের শুরুটা করেছিলেন মন্মথ রায় তাঁর 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) নাটকটির মধ্য দিয়ে। নাটকটি পাঠ করে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন- "যথার্থই একখানি ড্রামা।"[১] এই নাটক সম্পর্কে নজরুল ইসলামও ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।[২] বাংলা নাট্য সাহিত্যে মন্মথ রায়ের অসামান্য কৃতিত্বের কথা অবশ্যই স্বীকার্য, তবে এখানে মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব অথবা বিশেষত্বকে তুলে ধরার লক্ষ্যে নয়, বরং একাঙ্ক নাটকের বিশেষত্ব ও তার

সাফল্যের কথা তুলে ধরার প্রয়াস করা হচ্ছে। 'বাংলা একাঙ্ক নাটক' এই বিশেষ শ্রেণিকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস সুবৃহৎ। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটককে পুরোপরি একাঙ্ক বলে দাবি করা না গেলেও, তাঁর 'বিদায় অভিশাপ', 'ডাকঘর', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' এর মতো নাটকগুলির মধ্যে একাঙ্কের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মন্মথ রায়ের নাটকে উঠে এসেছে সমাজ জটিলতায় জর্জড়িত মানুষের চিত্র। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'একাঙ্কিকা', 'মহাপ্রেম', 'লালন ফকির'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংকটময় পরিস্থিতিতে বেশ কিছু একাঙ্ক নাটকের সমাহার নিয়ে আসেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকের মধ্যে রয়েছে- 'বোধন্', 'সীমান্তের ডাক', 'মুখর রাত্রি' প্রভৃতি। বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে এক নতুন পথ যুক্ত করে রচনা করলেন- 'শিককাবাব', 'অন্তরীক্ষ', 'আকাশ নীল' এর মতো স্বল্প আয়তনের নাটকগুলি। জোছনা ঘোষ দস্তিদার আরেকজন নাট্যকার, যিনি তাঁর একাঙ্কক নাটকগুলির মধ্যে তুলে ধরলেন খাদ্যসংকট ও শ্রমজীবী মানুষের কথা। তাঁর 'পাঁচটা থেকে সাতটা', 'পঙ্গপাল', 'জীবনের গান' প্রভৃতি নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। পরিমল গোস্বামীর 'ঘুঘু', 'পিপাসা' 'গুপ্তধরা' এর মতো একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে তুলে ধরা হল সমকালীন পরিস্থিতির কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক সন্ধ্যা', 'ভাড়াটে চাই', 'বারোভূতে' প্রভৃতিতে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত জীবন সংকটের ছবি। সুনীল দত্তের 'রাত কবে শেষ হবে', 'মুক্তির স্বাদ' এর মতো নাটকগুলির মধ্যে ভিন্ন দক্ষতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'উজানযাত্রা' ও 'ক্ষুধা' নাটকের মধ্যে সমাজ-দেশ-কাল-পাত্র মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ ও বাংলা নাট্যজগতের চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, মন্বন্তর 'গণ-সংগ্রাম' তাঁর নাটকের উপজীব্য বিষয়। 'আগুন', 'কলঙ্ক' তো আছেই, সেইসঙ্গে 'মরাচাঁদ', 'জননেতা', 'সাগ্নিক' এর মতো দৃশ্যবিভাজনহীন একাঙ্ক নাটকও তিনি রচনা করেছেন। উৎপল দত্তের 'লৌহমানব, 'কাকদ্বীপের এক মা', 'ঘুম নেই' নাটকগুলি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। কিরণ মৈত্রের 'কোথায় গেল!' নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের জীবনধারণের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মনোজ মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকেরা একাঙ্ক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা একাঙ্ক নাটকের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, প্লট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে অত্যাধিক বাস্তবধর্মী ঘটনাকে। যেখানে সামাজিক সমস্যাগুলি তুলে ধরা ও তা থেকে উত্তোরণের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় একাঙ্ক নাটকের দৈর্ঘ্য ও প্রকৃতি দুই-ই পৃথক। মোটামুটি একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা হিসেবে জানা যাচ্ছে, একটি অঙ্কে সীমাবদ্ধ, একাধিক দৃশ্যের সমাহারে একটি সরল ও একমুখী নাট্যকাহিনি। যে কাহিনিটি হবে সীমিত চরিত্রের সমাহারে, স্বল্প ব্যায়ে, শিল্পসম্মত, আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত।

> 'পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি অধিকাংশই পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে থাকে। এমনও দেখা যাচ্ছে যে কোনও কোনও দীর্ঘাঙ্ক নাটক দু'বছর ধরে অভিনয় হয়ে চলেছে। এই দু'বছরের শেষে সেই রঙ্গালয়ে হয়তো একটি নূতন নাটকের চাহিদা হতে পারে। নাট্যকার কি এতদিন নিশ্চল হয়ে বসে থাকবেন? তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ হবে কেমন করে? নাটক লেখার প্রচেষ্টাও কি তা হলে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে? তা হলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সম্ভাবনা কোথায়?
>
> নাট্য-প্রতিভার সেই গোপন উৎস এই পথে উৎসারিত করলে একাঙ্কিকার বিরাট সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এই জাতীয় নাটকের কখনও কখনও পেশাদারী রঙ্গালয়েও চাহিদা হতে পারে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের অভিনয় তো অবশ্যই হবে। তা ছাড়া সাধারণেরও সেইগুলি নিয়ে সখের অভিনয়ও করতে পারে। সর্বোপরি একাঙ্কিকা সাধারণের কাছে নিতান্ত সুপাঠ্য হয়ে উঠবে। পাঠকের সংখ্যা তার ফলে অনেক বেড়ে যাবে। তখন নাট্য-সাহিত্য সৃজনের একটা সার্থকতাও দেখা যাবে। তার ফলে একাঙ্ক-নাট্যকারগণের একটা আর্থিক সুবিধাও হতে পারে।'[৩]

মূলত অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছেন একাঙ্ক নাটককে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের অপেক্ষায় যেহেতু এর দৈর্ঘ্য কম সেহেতু এতে লোকবল, অর্থবল কম লাগে। সময়ও কম লাগে। প্রথম দিকে অনুবাদমূলক একাঙ্ক নাটক পরিবেশিত হলেও পরবর্তীতে মৌলিক একাঙ্ক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন অনেকেই। তবে বর্তমান

সময়ে একাঙ্ক নাটকের উপর দর্শকের ঝোঁক বেশি বলে মনে হয়। সভ্যতার অগ্রগতি, যন্ত্রনির্ভর সমাজ ও যান্ত্রিক মানসিকতায় মানুষের সময়ের অভাব তো বটেই ধৈর্য্যশক্তিরও অভাব ঘটছে। 'সোস্যাল মিডিয়া'র কয়েক সেকেন্ডের রিলস মানুষের ধৈর্য্য ও মনোযোগ ক্ষমতাকে হারিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান সময়ে একাঙ্ক নাটকের বিস্তার সম্পর্কে জানা যায়-

> 'বর্তমানে বহুস্থানে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা হইতেছে, আবার বহু নাট্য-সংস্থাও একাঙ্ক নাটকের উৎসবের আয়োজন করিতেছে। এই সব প্রতিযোগিতা ও উৎসবের ফলেও একাঙ্ক নাটকের অনেকখানি পরিপুষ্টি ঘটিতেছে। আর একটি সাধারণ যুগপ্রবনতার কথাও উল্লেখ করতে হবে। বর্তমান মানুষের সময় অল্প, মনোযোগ দিবার অবসরও কম। সে জন্য সে অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের কোনও রূপরস দেখিতে ও দেখাইতে চাহে। এর কারণ বর্তমান যুগে যেমন ছোটগল্প প্রসার লাভ করিতেছে, তেমনি প্রসার লাভ করিতেছে একাঙ্ক নাটক।'[৪]

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদর্শকে সামনে রেখে এবং প্রথাগত নাট্যধারা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গিকার নিয়ে শুরু হয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের একাঙ্ক নাটক লেখার প্রয়াস। ঋত্বিকের মৌলিক নাটকগুলি হল- 'জ্বালা' (১৯৫০), 'দলিল' (১৯৫২), 'সাঁকো' (১৯৫৪), 'সেই মেয়ে' (১৯৬৯), 'জ্বলন্ত' (১৯৭৫)। এছাড়া অনুবাদ করেছেন 'অফিসার' (১৯৫২), 'গ্যালিলিও চরিত' (১৯৬৪), 'খড়ির গণ্ডি' (১৯৬৫) নাটকগুলি। তাঁর মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজচিত্র। 'দলিল' নাটকটি তিনি প্রথম লিখতে শুরু করলেও 'জ্বালা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক। নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেশভাগের ঘটনাকে মেনে নিতে পারেননি। দেশভাগের করুণ যন্ত্রণাই ফুটে উঠেছে 'দলিল' নাটকটির মধ্যে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার চিত্র ধরা পড়েছে 'সাঁকো' নাটকে। 'সেই মেয়ে' সন্তানহারা শান্তির জীবনকাহিনির ওপর নির্মিত। 'জ্বলন্ত' নাটকটি এক কিশোরীর ধর্ষণের সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। 'জ্বালা' থেকে শুরু করে 'জ্বলন্ত', প্রত্যেক নাটকেই সভ্যতার সংকট ও মানুষের মূল্যবোধের অভাবকে তুলে ধরেছেন নাট্য রচনাকার ঋত্বিক ঘটক।

মাত্র এক মাসের মধ্যে কলকাতা শহরে অসংখ্য মানুষের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত 'জ্বালা' নাটকটি। নাটকে নেই কোনো দৃশ্য বিভাজন। মোট চরিত্র সংখ্যা ছয়, যথা- বধূ, খোকা, বুড়ো, মজুর, পিওন ও পাগল। বধূর নাম শেফালী, বুড়োর নাম পূর্ণচন্দ্র, মজুরের নাম ভোলানাথ। বাকিদের নাম নেই, কেবল আছে তাদের সামাজিক পরিচয়ের উল্লেখ। কারণ চরিত্রগুলির নামের থেকে তাদের সামাজিক পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে। পাগল ব্যতীত, বাকি সকলেই অতৃপ্ত আত্মা। যারা মুক্তির পথ হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলার মধ্যে মুক্তি নিহিত নেই; আছে জোট বাঁধার মধ্যে, আন্দোলনে, সেই বার্তাই নাটকে ধ্বনিত হয়েছে। নাটকের সূচনায় যে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তু, সমকালীন পরিস্থিতি, সেইসঙ্গে চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থাকে নির্দেশ করেছে-

> 'উঁচু-নীচু পিঙ্গল একটুকরো মালভূমি। আন্দোলিত প্রান্তরের শেষে নিঃসঙ্গ একটা পাতাহীন বাজে পোড়া বাবলা গাছ অজস্র বাহু উদ্যত করে আকাশকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। তার পিছনে ধোঁয়াটে পটভূমি নিঃস্বতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। ...সামনে পাশে এক আধটা কণ্টিকারি ফণিমনসা আসশ্যাওড়ার ঝোপঝাড়। বাঁয়ে কালো-পচা স্থির জল একটা এঁদো বিলের মাঝখানে চিক্‌চিক্ করছে। সেখান থেকে সূক্ষ্ম আস্তরণের মতো কুয়াশা উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে স্থির হয়ে আছে শূন্যে!...
>
> জনমানবহীন হতশ্রী রুক্ষ, প্রান্তর অপার্থিব সর্বহারাত্ম ফুটে আছে তার সর্বাঙ্গে। নিথর, হাওয়া নেই যেন কোথাও।'[৫]

এরপর প্রকৃতি ভীষণ অশান্ত, তীব্র বাজ পড়ার শব্দ হয় মঞ্চে। উল্লেখিত বাবলা, কণ্টিকারি, ফণিমনসা, আসশ্যাওড়া প্রতিটি গাছই কণ্টকময়। একইভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ ও পরিস্থিতিও কণ্টকপূর্ণ, বসবাসের অযোগ্য। স্বাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক মানুষ অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণের জাঁতাকলে পড়ে শুধু অত্যাচারিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিতই নয়, তারা ক্লান্ত ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এরূপ কণ্টকপূর্ণ স্থানে তারাই আসে যারা

আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। কালীঘাটের গৃহবধূ শেফালী গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অত্যন্ত মানসিক জ্বালা (যন্ত্রণা) নিয়ে তার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার স্বামী স্টেশন মাস্টার কালিদাসবাবুর আশি টাকা বেতনে পাঁচ সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যায় না। তাই সে জানায় এর থেকে 'ভিখিরি' হওয়া ভালো। কারণ- "এতো মান রাখার বালাই তো নেই তাতে।"[৬] -অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে এই সমস্যা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের। অভুক্ত সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে না পেরে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে মনের জ্বালার অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। তাই সে বলেছে- "লেখাপড়া করিনি, কিছু জানি না, তাই আগুন——।"[৭] রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দুও আগুনকেই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু গায়ে আগুন লাগানোকে সমাজ বলেছিল 'একটা ফ্যাশান'। পৃথিবীতে যত প্রকারের আত্মহত্যার পন্থা রয়েছে, সবথেকে কষ্ট দায়ক বোধহয় গায়ে আগুন লাগানো। মেয়েদের রান্নাঘর নামক এক ও অভিন্ন জগতের মধ্যে ওই বস্তুটি সহজেই পাওয়া যায়। খোকার জীবনধারণের উপায় ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। সে ছিল দেশভাগের শিকার। পাকিস্তান থেকে এসেছিল। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, হাবড়া প্লার্টফর্মে ভিক্ষা করত। ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। খোকা ও ঋত্বিক একই পরিণতির শিকার ছিল। কারণ একজন বর্তমান পাকিস্তান আর অন্যজন বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তুহারা শরণার্থী। দাদু অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র চাকরি না পেয়ে চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ভোলা কাজ করত জুট মিলে, পাটের 'শোঁয়া' বুকে প্রবেশ করে যক্ষায় আক্রান্ত হয়। মালিক তাড়িয়ে দেয়। হাসপাতালে বেড না পেয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে সে। পিওন কোনো এক কলেজে বেয়ারার কাজ করত। সে চেয়েছিল লেখাপড়া করে শিক্ষিত হতে। আমাদের দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই চায় না, সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হোক। তার ক্ষেত্রেও চাওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করে, কলেজে ভর্তি হলে উচ্চশিক্ষিত এক সমাজ তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। তার অন্যায় এটাই যে, সে শিক্ষিত হয়ে পৃথিবীকে জানতে চেয়েছিল। তার মতে মানুষের ইতিহাস হল- "মানুষের ইতিহাস কীসের ইতিহাস? Of class struggle."[৮] এই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ বাঙালি সমাজের পরিস্থিতি। নারী-পুরুষ, বালক-যুবক-বৃদ্ধ, ছাত্র-শ্রমিক নির্বিশেষে সকলেই এক বিরাট মানসিক অসহনীয় অবস্থার কবলে জর্জরিত; 'জ্বালা' নাটকের চরিত্ররা সেই কথাই বলে। পরাধীনতা মুক্ত ভারতবর্ষীয় স্বাধীন সমাজের প্রতিনিধি তারা, যে সমাজে প্রতিবাদের থেকে মৃত্যু সহজ।

'জ্বালা' শব্দের অভিধানিক অর্থ দুটি, যথা- যন্ত্রণা ও দাহ, একটি মানসিক আর অন্যটি শারীরিক, একটি মানব হৃদয় আরেকটি মানব শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে উভয়ই 'যন্ত্রণা'র উপলব্ধি ঘটায়। উল্লেখিত নাটকে 'জ্বালা' নামক অনুভূতির উৎসদাতা সমাজ। নাটকের প্রতিটি চরিত্র শারীরিক নয়, মানসিক জ্বালা তথা যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় একদা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কেউই মৃত্যু দিয়ে সেই জ্বালার নিবারণ করতে পারেনি। তাই বধূর সংলাপে হতাশা প্রকাশ পেয়েছে- "মনে পড়বে? না। পালিয়েও নিস্তার নেই!"[৯] মানসিক জ্বালা থেকে শেফালীরা পালিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে বিপন্নতার মুখে ফেলে এসেছে।

আত্মহত্যা নয়, বেঁচে থেকে লড়াই করার বার্তা দেওয়া হয়েছে নাটকে। তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে পৃথিবীকে তথা সমাজকে ভুল বার্তা প্রেরণ করে এসেছে। আত্মহত্যা 'কাপুরুষের' কর্ম, এই উপলব্ধি হয়েছে পিওনের। তারা লড়াইয়ের কোনো দৃষ্টান্ত রেখে আসেনি, বেঁচে থেকে লড়াইয়ের পথ দেখায়নি, যা দেখে পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে, অনুপ্রাণিত হবে। তাই প্রত্যেকে মৃত্যুর পরেও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। শেফালী ও পূর্ণচন্দ্রের কথোপকথনে উঠে এসেছে, সেই কথা-

> 'বধূ। তোর মা, দিদি, আমার ছেলেগুলো আপনার নাতি নাতনী— কী করে বাঁচবে?
>
> পূর্ণ। শুধু ওরা নয়, আরো লক্ষজন মানুষ ঠিক এররকম ভাবেই জ্বলছে। আমি নিজে দেখে এসেছি। তারাও ভাবছে, রেহাই পাবার আর কোনো পথ নেই। আমাদেরই মতো—।
>
> বধূ। সবাইকে কোন পথ নিতে হবে বললেন?
>
> পূর্ণ। আমাদের দেখানো পথ। আমরাই দেখিয়েছি।
>
> বধূ। না
>
> পূর্ণ। না কী? জ্বালা মেটানোর পথ নিজেকে শেষ করে দেওয়া, এটাই তো বললাম আমরা পৃথিবীকে। তুমি, আমি, ভোলা, পিওন, খোকা, আমরা সবাই মিলে, জানালাম— কে আছ জ্বালা

থেকে নিস্তার চাও কে আছ দগ্ধে মেরে ফেল, জীবনের শত্রু হও। আর লড়াই করতে হবে না, নিশ্চিন্ত আরাম তাহলে।

বধূ। আমার ছেলেরা কেন মরবে? ওদের মরা তো আমি চাইনি।

পূর্ণ। মিথ্যাবাদী। চাইনি কী, তাইতো চেয়েছে। আমরা পথ দেখিয়েছি, পথ শেষ হয়ে যাবার। বিনাশে সমাধা হবার। তবেই তো নির্বিকার নির্বিকল্প শান্তি।’[১০]

সবশেষে তারা জোট বাঁধার কথা বলেছে। নাটকের সমাপ্তি হয়েছে সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তামূলক ভোলার এই গানের মধ্য দিয়ে- “...অব্ কোমর বান্ধ তৈয়ার হো, লাখ কোটি ভাইয়ো, হো তৈয়ার’...।”[১১] অন্যদিকে পূর্ণচন্দ্র আর বধূর কথোপকথন-

‘পূর্ণ। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন আমার কাছে। ওই ভুলটাই আমারা করেছিলাম। জোট বাঁধা দরকার। তবে এখন আর ভেবে কি হবে?

বধূ। কেন? আমাদের ছেলেপুলেরা তো আছে পৃথিবীতে— তারা জোট বাঁধলে বাঁচবে।’[১২]

জোট বাঁধা ও লড়াই করার মধ্যেই মুক্তি, এই বার্তা পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে যাবে পাগল। সংঘবদ্ধ হতে পারলে কাউকে জ্বালায় জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে না। এরূপ এক নতুন সকালের সূচনা দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটছে।

সমস্ত হতাশা, গ্লানি ভুলে নতুন পথের সন্ধানের বার্তা নিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নাটক সমাপ্তি হয়ে থাকে। বিজন ভট্টাচার্য্যের ‘নবান্ন’ নাটকেও এই দৃশ্য লক্ষ করা যায়। উক্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে দয়াল বলেছে- “জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!”[১৩] এরকমই এক প্রতিরোধ বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে ‘জ্বালা’ নাটকের পাগল, যেটা হয়ে উঠবে- “মরার দেশে বাঁচার খবর।”[১৪] তাই পূর্ণচন্দ্র এক নতুন দেশের স্বপ্ন দেখে, যেখানে শান্তি পাওয়া যায়- “সে এক দেশ আছে। সুন্দর দেশ। তারি পথ খুঁজছি...সেখানে সব শান্তি সব তৃপ্তি। কোথাও একটা আছেই।”[১৫] একদা প্রাচীন ভারতবর্ষ এই দেশের স্বপ্ন দেখেছিল। বৃদ্ধ পূর্ণচন্দ্র আশাবাদী, সংঘবদ্ধ হয়েই সেই দেশকে খুঁজে বের করতে হবে বলে সে জানায়।

যেকোনো শিল্পকলাই ‘সমাজের দর্পণ’, তবে তা অধিক মানুষের কাছে পৌঁছানো বেশি জরুরি। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, মন্বন্তর সবটাই প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। যা তিনি চিত্রিত করেছেন সাহিত্য ও চলচ্চিত্র মাধ্যমকে অবলম্বন করে। বাস্তবতাকে তুলে ধরতে তিনি কোনো আপোস করেননি, যেকারণে তিনি মানেননি কোনো প্রচলিত নাট্য রীতি। যা কেবল সত্য, তা প্রকাশ করা জরুরি, এই ধারণা থেকে ঋত্বিক ‘ডাইডাকটিস’ নাট্যধারাকে খানিকটা স্বীকার করেছেন। এই ধারা বলে ‘Drama of Truth’ ও ‘Drama of Documentation’ এর কথা। তাই শিল্পের আঙ্গিক নয়, বার্তা ও বক্তব্য জরুরি হয়ে উঠেছিল ঋত্বিকের কাছে। এই একই উদ্দেশ্যের কথা বলেছিল ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’। দেশভাগের প্রাক্-কালে যখন অবিভক্ত বঙ্গদেশের টালমাটাল অবস্থা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে গড়ে উঠেছিল ‘অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট’ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই সংঘের শুরুটা হয়েছিল মোটামুটি ১৯৪১ সাল নাগাদ। মানুষ ও তার সুখ-দুঃখের সহমর্মী হওয়াই গণনাট্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। ‘নবান্ন’ ছিল এই সংঘের চরম সার্থক নাটক। নাটকটি ভীষণভাবে উজ্জীবিত করেছিল বাংলার কৃষক সমাজকে। এই সংঘের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায়-

‘শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছোট ব্যবসাদার প্রভৃতিদের দ্বারাই আজ দেশের অগণন জনতা সংগঠিত। ইহারাই দেশের সর্বাপ্রেক্ষা অধিক অংশ। ইহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সব অতীতমুখী ও বিজাতীয় ভাবধারা কাজ করিতেছে ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইহাদের পরিপন্থী হইতেছে— গণনাট্য সংঘের শত্রু তাহারাই। সে জানে দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাহার কাজের সহায়।’[১৬]

এরূপ একটা আদর্শকে সামনে রেখে ১৯৪৩ সালে সৃষ্টি হয়েছিল গণনাট্য সংঘের আন্দোলন। যাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক পথকে অবলম্বন করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা প্রেরণ করা।

‘প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল— শেষ হয়ে যাচ্ছিল বাঙালি জীবনের মূল্যবান পিতার স্নেহ, মাতার মমতা, সংসারের সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধন— য়ুরোপীয়দের মহাযুদ্ধের বলি হচ্ছিল বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ। মন্বন্তর, মহামারী, মৃত্যুর বিরুদ্ধে কতটুকু প্রতিরোধ রচনা করতে

> পেরেছিল মানুষ? তবু চেষ্টা করেছিল, কিছু প্রাণ যন্ত্রণায় অস্থির তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নানা ছোট বড় সংগঠন গড়েছিল এই শপথ ঘোষণা করে 'আমরা মরব না মরতে দেব না আমাদের ভাই-বোনদের'। ঘোষণা করেছিল তাদের গানের দল পথে-ঘাটে, ট্রামে বাসে; ঘোষণা করেছিল কবিরা কবিতায়, সাহিত্যিকেরা গল্পে, উপন্যাসে, সম্মিলিত সাহিত্য সংস্কৃতির আয়োজনে; মাঠের সভায়, পথের মিছিলে, নাট্যমঞ্চের নাটকে, নৃত্যতে।'[১৭]

এই দলে ছিলেন ঋত্বিক ঘটকও। তিনি ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত।

ঋত্বিক ঘটক ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে সম্পর্কের কথা সকলেরই অবগত। বরং বলা ভালো গণনাট্য সংঘের আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হয়েছিল ঋত্বিকের নাট্যচর্চা। নাটক অথবা চলচ্চিত্র প্রতিটি মাধ্যমকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সমাজের সত্য উদ্ঘাটনের অবলম্বন হিসেবে। 'জ্বালা' নাটকে সেইসব মৃত আত্মারা একজোট হতে চেয়েছে, যারা সমাজের এক শ্রেণির মানুষ দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত। ১৯৫০ সালের কলকাতা শহরে মাত্র এক মাসের মধ্যে অসংখ্য মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। এইরকমই কিছু চরিত্রের সমাহারে লেখা 'জ্বালা' নাটক। একাঙ্ক নাটকের হাত ধরে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' এর যাত্রাপথ শুরু। প্রথাগত নাট্য রীতিকে মেনে নিতেই হবে, এমন ভাবধারায় বিশ্বাস রাখত না এই সংঘ। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একাঙ্ক নাটক রচনা অনেকটাই আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। সমাজের শোষক আর শোষিতের চিত্রকে তুলে ধরতে নাট্যকারেরা অবলম্বন করেছিলেন একাঙ্ক নাট্যরীতির। তাই বলা যায়, বাংলা একাঙ্ক নাটক ও ঋত্বিক ঘটকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ঋত্বিক ঘটক, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও বাংলা একাঙ্ক নাটক; সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়ে এই তিনের সংগমস্থলে উপস্থিত হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' নাটকটি।

তথ্যসূত্র:

1. একাঙ্ক নাটক সংকলন, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা, ৩, সিণ্ডিকেট প্রাউভেট লিমিটেড. প্রকাশচন্দ্র সাহা (প্রকাশক). প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৫৮. পৃ- ভূমিকা (গ). https://archive.org/details/dli.bengal.10689.22365/page/n15/mode/2up, accessed on 26-03-2025) ।
2. তদেব।
3. তদেব, পৃ- ভূমিকা অংশ (গ-ঘ)।
4. ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা, ১৩, প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী সুরজিৎচন্দ্র দাস (প্রকাশক), পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৬০. পৃ- ৫৯৪।
5. বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ, রবীন্দ্রভবন, ৩৫, ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি, ১১০০০১, সাহিত্য অকাদেমি. প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০. পৃ- ১৯৯ (https://ia801902.us.archive.org/9/items/in.ernet.dli.2015.301813/2015.301813.Bangla-Ekanka_text.pdf, accessed on 29-03-2025)।
6. তদেব, পৃ- ২০০।
7. তদেব, পৃ- ২০৫।
8. তদেব, পৃ- ২০৯।
9. তদেব, পৃ- ২০২।
10. তদেব, পৃ- ২০৭।
11. তদেব, পৃ- ২১২।
12. তদেব, পৃ- ২১৫।

13. বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, ৯,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এস দত্ত (প্রকাশক), চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ, ১৯৬২, পৃ- ১৪৩।
14. বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগহ, রবীন্দ্রভবন, ৩৫, ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি, ১১০০০১,সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০. পৃ- ২১৬ https://ia801902.us.archive.org/9/items/in.ernet.dli.2015.301813/2015.301813.Bangla-Ekanka_text.pdf, accessed on 28-03-2025
15. তদেব, পৃ- ২০৬
16. ঘটক,ঋত্বিক কুমার, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩: দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৫, পৃ- ৪২
17. ঘটক, ঋত্বিক কুমার, ঋত্বিক ঘটকের গল্পসংগ্রহ, ৪৩, কনকর্ড এম্পেরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪, এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন, ঢাকা, ১২০৫: কবি প্রকাশনী. প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০১৬. পৃ- ভূমিকা অংশ